মডিউল-১৯

কোর্সকোড- BENG-H-GE-T-2

কোর্স নাম -বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব (২য় ভাগ)

মিলন মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

বাংলা শব্দভাণ্ডার

১৯.১ উদ্দেশ্য:

এই এককটি পাঠ করলে–

- **ভাষার শব্দভাণ্ডারর গড়ে ওঠার সাধারণ পক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।**
- **বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির উৎসগুলিকে নির্দিষ্ট করতে পারবেন।**
- **বাংলা শব্দ হিসাবে পরিচিত কিন্তু মূলত ভিন্ন প্রাদেশিক বা বিদেশি শব্দগুলিকে চিনে নিতে পারবেন।**

১৯.২ প্রস্তাবনা:

কোনো ভাষার সমৃদ্ধি প্রধানত নির্ভর করে তার শব্দভাণ্ডারের উপর। যে ভাষার শব্দ-সম্ভার যত বেশি সেই ভাষাও ততবেশি সমযুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। কোনো ভাষার শুধুমাত্র শব্দজ্ঞানের সাহায্যেই কাজ চালিয়ে নেবার মতো মনোভাব প্রকাশ করা সম্ভব। আমরা এর পূর্ববর্তী এককে শব্দার্থের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখেছি, শব্দরাশি যে শুধু ভাবপ্রকাশেরই উপাদান তা নয়, এর মধ্যদিয়ে ভাষা ব্যবহারকারী একটি জাতির আচার ব্যবহার, সভ্যতা ও সংস্কৃতি–এককথায় তার প্রাণরহস্যের সন্ধানও পাওয়া যায়।

সমাজ জীবনের পরিবর্তনের ফলে, একদা সমাজ প্রচলিত অনেক জিনিস অচল হয়ে যায়, সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারায় পুরনো ধ্যানধারণারও অবলুপ্তি ঘটে। আবার পাশাপাশি নতুন যুগের নতুন বস্তু, নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতা সমাজ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেখা দেয়। যেগুলি অপ্রচলিত হয়ে যায়, সেগুলির অর্থপ্রকাশক শব্দাবলিও ভাষায় অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। আবার নতুন বস্তুও ধারণার উপযোগী শব্দ সেইস্থান অধিকার করে। যেমন একদা আমাদের সমাজে চিকিৎসার কাজে আয়ুর্বেদের বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যা আমাদের কাছে আর আদৃত নয়। তাই আমরা ভুলেই গেছি একদা প্রচলিত, অতি-পরিচিত বেশ কিছু ওষুধের নাম যেমন 'বৃহৎ ছাগলাদ্যঘৃত' বা 'বৃহৎ প্রাণেশ্বর'। বৈদিক যুগে যেসকল দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল, তাঁদের অনেকর উপাসনাই আমরা আজ আর করি না। ফলে সেইসব দেবদেবীর নাম এখন অপ্রচলিত। যেমন–অদিতি, পর্জণ্য,

পূষণ ইত্যাদি। একই সঙ্গে লক্ষ্য করুন–আসবাব হিসাবে কত নতুন জিনিসের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি এবং তাদের গ্রহণও করেছি নিত্য প্রয়োজনীয় হিসাবে। তাদের নামগুলিও এখন আমাদের কাছে নিত্যব্যবহার্য। অথচ ইংরেজরা আসার আগে ওই বস্তুগুলির সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। ইংরেজদের মাধ্যমেই ওই বস্তুগুলি আমাদের জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হয়েছে। যেমন–চেয়ার, টুল, ডিভান, সোফা ইত্যাদি।

এইভাবেই গ্রহণ বর্জনের মধ্যদিয়ে কোনো একটি ভাষার শব্দ-সম্পদ গড়ে ওঠে। প্রয়োজনের নিরিখে শব্দাবলীর অস্তিত্ব নির্ভর করে যে কোনো ভাষায়।

১৯.৩ শব্দাবলির উৎসানুযায়ী শ্রেণিবিন্যাস:

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা তথা সংস্কৃত থেকে, মধ্যভারতীয় আর্যভাষা তথা প্রাকৃত অবহট্টের মধ্য দিয়ে বাংলাভাষা জন্মলাভ করেছে। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা নানা দেশি ও বিদেশি শব্দ আত্মসাৎ করে তাদের নিজের ব্যাকরণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল। এই সকল শব্দাবলি অবিকৃত বা ধ্বনিগত বিবর্তনের স্তর পরস্পরা পার হয়ে বাংলাভাষায় প্রবেশ করেছে। উপরন্তু ঐতিহাসিক গতিতে যত বিদেশি জাতি এদেশে এসেছে এবং শাসকরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাদের ভাষার শব্দাবলিও কালক্রমে বাংলার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারে গৃহীত হয়ে গেছে। এতরকম উৎস থেকে প্রাপ্ত শব্দাবলিকে তাই প্রাথমিকভাবে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়–

(১) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ
(২) অন্যসূত্রে আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ
(৩) ভাষায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা শব্দ

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ:

এই পর্যায়ভুক্ত শব্দগুলিকে 'মৌলিক শব্দ' নামেও অভিহিত করা হয়। যেহেতু ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা ও অনার্য-ভাষার শব্দাবলিই এই অঙ্গীভূত, সেইহেতু দেশজ ঐতিহ্যের দিকে নজর রেখে এই নাম দেওয়া হয়েছে। এই শব্দগুলি কখনও মূল ধ্বনিসংগঠনের রূপ যথাযথ রেখে, কখনও আবার উচ্চারণবিকার রূপান্তরিতভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে এসেছে। এই বিকৃতির দিকে লক্ষ রেখেই এই পর্বে শব্দগুলিকে আমরা তিনটি উচ্চশ্রেণিতে সাজাতে পারি– (ক) তৎসম শব্দ (খ) তদ্ভব শব্দ এবং (গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ।

অন্যসূত্র আহৃত আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ:

এই শব্দগুলি প্রাকৃতের স্তর পার হয়ে আসা, সংস্কৃতে একদা গৃহীত, প্রাচীন বিদেশিভাষার শব্দ নয়। এগুলি মধ্যযুগ ও আধুনিকযুগে রাজভাষারূপে ব্যবহৃত, বিদেশি, ভিন্নভাষা ব্যবহারকারী শাসকের ভাষা থেকে গৃহীত। বাংলায় তুর্কি শাসনের সময় থেকে এক দীর্ঘ পর্বের ইতিহাস এই বিদেশি শাসকবর্গের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলে বিভিন্ন বৈদেশিক শব্দ এই সময়পর্বে বাংলা ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে। এগুলিকেই আগন্তুক শব্দ বা বতঋণ শব্দ বলে চিহ্নিত করা যায়। এই জাতীয় শব্দে কখনও মূল বানানোর সদৃশ উচ্চারিত রূপ, কখনও বাংলাভাষার নিজস্ব উচ্চারণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্যরূপ প্রচলিত হতে দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের মাধ্যমেও বহু বিদেশি শব্দ বাংলা ভাষায় স্থায়ী আসন অধিকার করে নিয়েছে। এগুলিও এই এই শ্রেণিভুক্ত হবার দাবি রাখে। এই প্রসঙ্গে মনে করতে পারেন সোভিয়েত রাশিয়ায় কিছু বছছর আগেই যখন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদারনীতির হাওয়া বইতে শুরু করেছি, তখন 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রৈকা' শব্দটি এই পদ্ধতিতেই আমাদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল।

ভাষায় নতুনভাবে সৃষ্টি করা শব্দ:

বাংলা ভাষায় কিছু শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়, যেগুলি অন্য ভাষাজাত নয়, বিবর্তনের ধারা পার হয়ে আসা দেশজ বা তৎসম শব্দও সেগুলির উৎস নয়।

শব্দ গঠন করতে গেলে রূপমূল ও প্রত্যয়বিভক্তি যুক্ত করার প্রচলিত রীতিটিকে বজ রেখেই এখনে এমন কিছু শব্দ তৈরি করা হয়েছে যেগুলির রূপমূলটি কাল্পনিক অর্থাৎ সংস্কৃতে তার উৎস পাওয়া যায় না। এই সূত্রে আমরা আমাদের অতিপরিচিত একটি শব্দের অস্তিত্ব লক্ষ্য করতে পারি, যেমন–'প্রোটি'। এর মূল যে 'প্রোথ্' ধাতু, সেটি কাল্পনিক, যার সঙ্গে 'ইত' যোগ করা হয়েছে 'প্রোথিত'। এই ধরনের শব্দগুলির এরকম বর্ণচোরা অস্তিত্বের কারণে ভাষাতাত্ত্বিকরা এগুলিকে 'ভুয়া শব্দ' নামে চিহ্নিত করতে চান। তৎসমশব্দের আচ্ছাদনে এরকম আরও কিছু শব্দ আছে সেগুলি হয় অন্যভাষা থেকে আগত শব্দের অনূদিত রূপ, (যেমন–যোজনা <Planning, বিশ্ববিদ্যালয় <University ইত্যাদি) অথবা বহিরাগত শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের রূপ (যেমন–মিনিত < আরবী 'মিন্নৎ' + বাংলা 'নতি', 'বিদায়' < আরবী 'ওয়াদা', কিন্তু শব্দটি 'আদায়' প্রদায় এর মত অর্বাচীন সংস্কৃতেও ঢুকে গেছে।) এইভাবে ননোবদিত শব্দ প্রয়োজনের নিরিখেই শব্দ ভাণ্ডারের অন্যস্থান পূরণ করে চলেছে।

১৯.৪ বাংলা শব্দভাণ্ডারে ব্যবহৃত শব্দের উৎসনির্ণয়:

আসুন, এইবারে শব্দভাণ্ডারে প্রবেশ করা শব্দের উৎসমূল সম্পর্কে যে তিনটি র সন্ধান পেলাম, বাংলাভাষার শব্দগুলিকে সেই ধারায় কীভাবে বিন্যস্ত করা যায় তা লক্ষ্য করি। আমাদের দৈন ব্যবহারে কথ্য বাংলার বিভিন্ন শব্দাবলি আমাদের একান্ত অসচেতন প্রয়াসেই উচ্চারিত প্রয়াসেই উচ্চারিত হয়ে চলে। অর্থপ্রকাশ বা ভাবের যথার্থ পরিস্ফূরণই সেখানে আমাদের মূল লক্ষ্য। শব্দের উৎস, মূলরূপ ইত্যাদি নিয়ে আমরা সচরাচর মাথা ঘামাই না। কিন্তু এ ব্যাপারে ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা চমকপ্রদ। বাংলা শব্দভাণ্ডারের যতখানি জুড়ে আছে আমাদের ঐতিহ্যসূত্রে প্রাপ্ত দেশজ বা সংস্কৃতজ শব্দ, প্রায় ঠিক ততটাই জুড়ে আছে বহিরাগত বিদেশি ভাষার শব্দ। একান্ত পরিচিত, কথ্যবাংলায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলিও দেখা যায় প্রকৃতপক্ষে বিদেশি ভাষাজস্ঠ। আসুন,

বাংলার ব্যবহৃত অতিপরিচিত শব্দগুলির মধ্য থেকেই এই ত্রিধারার বহমানতা অনুভব করি।

১৯.৪.১ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বাংলা শব্দাবলি:

প্রথম শ্রেণি হিসাবে আমরা দেখেছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দগুলিকে, যার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (ক) তৎসম, (খ) তদ্ভব ও (গ) অর্ধ তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দগুলি। আমাদের পরিচিত, নিত্যব্যবহৃত শব্দাবলির মধ্য থেকেই এই উপশ্রেণির শব্দাবলি আমরা খুঁজে পেতে পারি। এই তিনটি উপশ্রেণিকে ক্রমান্বয়ে আমরা বিশ্লেষণ করব এই –

(ক) তৎসম শব্দ

যেসব শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (বৈদিক বা সংস্কৃত) থেকে অপরিবর্তিতভাবে বাংলায় এসেছে সেগুলিকে 'তৎসম' শব্দ বলা হয়। 'তৎ' বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে মূল উৎসস্বরূপ বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষাকে। অর্থাৎ 'তৎসম' মানে 'তাহার সমান' বা ঠিক তার মতো, এক কথায় অপরিবর্তিত শব্দ। বাংলায় এই জাতীয় শব্দের সংখ্যা অনেক। যেমন–জল, বায়ু, সূর্য, মিত্র, জীবন, মৃত্যু, বৃক্ষ, লতা, নারী, পুরুষ ইত্যাদি।

এই তৎসম শব্দগুলি আবার দুটি শ্রেণি দেখা যায়, যে দুটিকে ভাষাবিদ্‌গণ 'সিদ্ধ' ও 'সিদ্ধ' এই দুই বিশেষণে নির্দিষ্ট করেছে। তাদের মতে–

সিদ্ধ তৎসম শব্দই সেই শব্দগুলি, যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় এবং ব্যাকরণসিদ্ধ। যেমন–সূর্য, মিত্র, কৃষ্ণ, লতা ইত্যাদি।

আর অসিদ্ধ তৎসমশব্দ হল সেই শব্দগুলি, যেগুলি বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায় না বা ব্যাকরণসিদ্ধ নয়, অথচ রাচীনকালে কথ্য সংস্কৃতে প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে এই নামে চিহ্নিত করা হয়। যেমন–কৃষাণ, ঘ, চলা ডাল (গাছের ডাল) ইত্যাদি।

(খ) তদ্ভব শব্দ

এই শব্দগুলি সাত থেকে সোজাসুজি বাংলায় আসেনি, মধ্যবর্তীপর্বে প্রাকৃতের স্তর পেরিয়ে পরিবর্তিতরূপে বাংলাভাষায় এসেছে এই জাতীয় শব্দ বাংলাভাষায় সংখ্যার দিক থেকে যেমন প্রচুর তেমনি এগুলির গুরুত্বও লক্ষণীয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা ভাষার শব্দ সম্পদের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ এই জাতীয় শব্দগুলি। যেমন–

ইন্দ্রাগার (সং) ইন্দ্রাআর (প্রা:) > ইন্দারা, ইঁদারা (বাং)

হস্ত (সং) > হত্থ (প্রা) > হাথ (প্রাচীন বাং) > হাথ (বাং)

নপ্তৃক (সং) > ণত্তিঅ (প্রা) > নাতি (বাং)

রাজ্ঞিকা (সং) রন্নিআ (প্রা) রাণী (বাং)

তদ্ভব শব্দগুলিকেও দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। একটি যথার্থ বৈদিক বা সংস্কৃত শ্বদর পরিবর্তিত রূপ। এগুলিকে কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক 'নিজস্ব তদ্ভব' বলে চিহ্নিত করেন। যেমন–

কৃষ্ণ (সং) > কণ্হ (প্রা) > কাণ্হ (প্রা. বাং) > কান (ম. বাং)

পরে আদরার্থে 'উ' বা 'আই' প্রত্যয়যোগে কানু, কানাই।

উপাধ্যায় (সং) > উবজঝাঅ (প্রা) > ওঝা (বাং) ইত্যাদি।

দ্বিতীয়টিতে বৈদিক বা সংস্কৃতভাষার এমনকিছু শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেগুলি সর্বপ্রথম ইন্দো ইউরোপীয় বংশের কোনো ভাষা বা ইন্দো-ইউরোপীয় ছাড়া অন্য কোনো বংশের ভাষা থেকে এসে বৈদিক বা সংস্কৃত অনুপ্রবেশ করেছিল। কালক্রমে সেগুলি প্রাকৃতের পথেই বিবর্তিত হয়ে বাংলাভাষায় এসেছে। তবে যেহেতু বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব শব্দ এগুলি নয়, বরং বলা ভালো ঋণকৃত, তাই এই জাতীয় শব্দের বিবর্তনের ধারায় প্রাপ্ত তদ্ভব শব্দগুলিকে কেউ কেউ 'কৃতঋণ তদ্ভব' বলে উল্লেখ করতে চান। যেমন–

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্যভাষাজাত:

গ্রিক-'দ্রাখমে' > দ্রম্য (সং) > দম্ম (প্রা) > দাম (বাং)

প্রাচীন পারসিক–'কর্শ' > কার্ষাপণ (সং) > কাহাবণ (প্রা) > কাহন (বাং)

ইন্দো-ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য ভাষাবংশের কোনোভাষাজাত:

দ্রাবিড় বংশের তামিল 'পিল্লৈ' > পিল্লিক (সং) > পিল্লিঅ (প্রা) > পিলে (বাং)

'মুটে' > মুটুক (সং) > মুড়অ (প্রা) > মোট (বাং)

অস্ট্রিক ভাষা বংশের থেকে আগত সংস্কৃত 'ঢক্ক' > প্রাকৃত ঢক্ক > বাংলায় ঢাকা।

মোঙ্গল ভাষাবংশের থেকে আগত সংস্কৃত তুর্ক > প্রাকৃত তরুক্ক > বাংলায় তুরুক্ক।

মনে রাখবেন, এই যে শব্দগুলির দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, এগুলি বাংলায় এসেছে বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার পথ বেয়ে অর্থাৎ ঘুরপথে, সরাসরি নয়। এখানেই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দের সঙ্গে এগুলির তফাত।

(গ) অর্ধ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ:

যেমন শব্দ প্রাচীন ভারতীয় আর্য (বৈদিক / সংস্কৃত) থেকে মধ্যবর্তী প্রাকৃতের স্তর পার না হয়ে, সোজাসুজি বাংলায় এসেছ এবং আসর পর কালোচিত বিকৃতি ও পরিবর্তন লাভ করেছে, সেই শব্দগুলিকে অর্থ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলিকে আমরা বিকৃত তৎসম শব্দ বলে অভিহিত করতে পারি। আমাদের আটপৌরে ভাষারীতিতে এই জাতীয় শব্দের অস্তিত্বও প্রচুর। যেমন–কৃষ্ণ (সং) > কেষ্ট (অর্থতৎ), নিমন্ত্রণ >নেমতন্ন, শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ, পুরোহিত > পুরুত, বৈষ্ণব > মোচ্ছব, যজ্ঞ > যজ্ঞি ইত্যাদি।

১৯.৪.২ সারসংক্ষেপ :

এইবার বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রথম উৎস হিসাবে যেদিকটি নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত সার তৈরি করে নিতে পারি এইভাবে–বাংলা শব্দভাণ্ডারে আছে–

সংস্কৃত বা বৈদিক ভাষা থেকে, প্রাকৃতের পথ বেয়ে আগত শব্দাবলি, যার মধ্যে আছে তিন শ্রেণির শব্দ–

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশজাত বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব শব্দ

(খ) ইন্দো-ইউরোপীয় ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাবংশজাত শব্দ (দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মোঙ্গল)

আর আছে (গ) প্রাকৃতের পথে না এসে, বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষা থেকে সরাসরি বাংলায় গৃহীত শব্দাবলি যেগুলি

(অ) কখনও অবিকৃত উচ্চারণে, মূলের যথাযৃত রূপ বজায় রেখেই ব্যবহৃত হয়।

(আ) আমববার কখনও বাংলায় নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতির কারণে খানিকটা বিকৃত রূপে ব্যবহৃত হয়।

সেইসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে রাখবেন, কোনো শব্দ শব্দ শুধু তৎসম রূপে, কোনোটি তদ্ভব রূপান্তরে বা কোনোটি ভগ্ন-তৎসম বিকারে যেমন ব্যবহৃত হয়, তেমনি একই সঙ্গে দুটি বা তিনটি রূপেই কোনো কোনো শব্দ ভাষায় প্রচলিত থাকতে পারে। যেমন–

তৎসম	অর্ধতৎসম	তদ্ভব
বৈদ্য	বদ্দি	–
গৃহিনী	গিন্নি	ঘরনী
চন্দ্র	চন্দর	চাঁদ
রাত্রি	রাত্তির	রাত
কৃষ্ণ	কেষ্ট	কানু
জ্যোৎস্না	জোছনা	–

১৯.৫ আগন্তুক / কৃতঋণ শব্দ:

আসুন, এইবার বাংলা শব্দভাণ্ডার গটনে দ্বিতীয় উৎসটিকে তার শব্দাবলি সহ চিনে নেবার চেষ্টা করি। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে–বৈদিক বা সংস্কৃতভাষা থেকে সলাসরি বা প্রাকৃতের পথ বেয়ে যে শব্দাবলি বাংলায় এসেছে, তাছাড়া অন্য সমস্তই শব্দগুলিই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দ। এক কথায় আমরা বলতে পারি–এগুলি কোনো অবস্থাতেই বৈদিক বা সংস্কৃত ভাষাজাত শব্দ নয়, অন্যভাষা থেকে সংস্কৃতের পথ বেয়ে প্রাকৃতের বিবর্তনধারা পার হয়ে আসা শব্দও নয়, এগুলি ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের বা বিদেশি কোনো ভাষা থেকে সরাসরি বাংলা ভাষায় গৃহীত শব্দাবলি।

মনে রাখবেন 'কৃতঋণ তদ্ভব' শব্দগুলি সংস্কৃত ভাষায় আগে এসেছিল, তারপর বাংলাভাষায়। কিন্তু আগন্তুক/কৃতঋণ শব্দগুলির গায়ে সংস্কৃতের ছোঁয়াচ লাগেনি, সেগুলি সরাসরি বত্রাংলায় এসেছে তাদ্রেদর ুৎস ভাষা থেকে।

এই আগন্তুক শব্দগুলিও আবার তিনটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত হতে পারে (১) দেশি, (২) প্রাদেশিক, (৩) বিদেশি।

(১) দেশি শব্দ– ভারতবর্ষে আর্যরা আসার আগে যে যে গোষ্ঠী এদেশে বস করত, তাদের নিজস্ব ভাষার কিছু কিছু শব্দ আমরা বিভিন্ন ভারতীয় আর্যভাষায় গ্রহণ করেছিলাম। এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথা থেকে আসে তা জানা না থাকলেও আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক বা ভোট-বর্মী

ভাষাগোষ্ঠীকে এগুলির উৎস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগেই দেখেছেন, এইসব ভাষার বেশ কিছু শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হয়ে তৎসম শব্দের মর্যাদা লাভ করেছে। অন্যান্য আরো কিছু শব্দ বাংলাভাষায় সরাসরি প্রবেশ করে 'দেশি শব্দ' হিসাবে আমাদের শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এই পর্যায়ের শব্দ হিসাবে বাংলা ভাষায় দেখতে পাবেন এদের–

দ্রাবিড় ভাষাজাত– ইডলি, চেট্টি, চুরুট, আকাল ইত্যাদি।

অস্ট্রিক ভাষাজাত– ডাব, ঢোল, ঢিল, ঢেংকি, ঝাঁটা, ঝোল, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, খড়, ডিঙ্গা, মুড়ি, কুলা, চুলা ইত্যাদি।

ভোট-বর্মী ভাষাজাত– লুঙ্গী, লামা ইত্যাদি।

(২) প্রাদেশিক শব্দ–ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত নব্যভারতীয় আর্যভাষার বেশ কিছু শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে। এগুলিও আগন্তুক বা কৃতঋণ পর্যায়ভুক্ত। যেমন–

পাঞ্জাবী ভাষা থেকে– শিখ, চাহিদা প্রভৃতি

মারাঠী ভাষা থেকে– বর্গী, পাটিল।

গুজরাটী ভাষা থেকে– হরতাল, গরবা, খাদি, তকলি ইত্যাদি।

হিন্দি ভাষা থেকে– কুত্তা, পানি, লাগাতার, বন্ধ্, ঝণ্ডা, মিঠাই, সমঝোতা, বদলা, খতম, জলদি ইত্যাদি।

(৩) বিদেশি শব্দ–যেসব শব্দ ভারতবর্ষের বাইরের অন্য কোনো দেশে প্রচলিত ভাষার থেকে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেইসব শব্দগুলি বিদেশি কৃতঋণ শব্দ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদেশি জাতি এদেশে আসে এবং শাসনতান্ত্রিক বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে দীর্ঘকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব ভাষার বেশ কিছু শব্দ এই সহাবস্থানের ফলে বাংলভাষায় অনুপ্রবেশ করেছিল এবং বর্তমানে বাংলাভাষার দেহে তারা এমনভাবে মিশে গেছে যে এদের আর বিদেশি বলে চেনার উপায়ও নেই।

এই সূত্রে সর্বপ্রথম উল্লিখিত হতে পারে তুর্কি-মুঘল-পাঠান জাতীয় মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আগত আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দাবলি। প্রায় হাজার বছর আগে আসা এইসব ভাষা-ব্যবহারকারী মুসলমানরা রাজনৈতিক কারণে এদেশে প্রায় সাতশ' বছর শাসক হিসাবে ছিলেন। ফলে রাজভাষা হিসাবে এদেশে এইসব ভাষাগুলির একসময়ে যথেষ্ট অর্থকরী জনপ্রিয়তা এবং প্রতিপত্তি ছিল। এই কারণেই অতি দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে এইসব ভাষার শব্দাবলি বাংলাভাষায় প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত ফারসি এবং ফারসির মাধ্যমেই কিছু তুর্কি ও আরবি শব্দকে বাংলাভাষা আত্মীকরণ করে নিজস্ব সম্পদে পরিণত করেছে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে প্রায় আড়াই হাজার ফারসি ও ফারসি-মাধ্যমে আগত আরবি ও তুর্কি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে। যেমন–

ফারসি শব্দ–হাওয়া, রোজ, হপ্তা, উকিল, জমি, মজুর, আন্দাজ, জাহাজ, পেয়ালা, খুব, জোর দূরবীন, সিন্দুক প্রভৃতি।

আরবি শব্দ (ফারসি মাধ্যমে)– আইন, আক্কেল, কেচ্ছা (কস্‌সা), কিতাব, জেলা, তাজ্জব, নিক্তি, আতর ইত্যাদি।

তুর্কি শব্দ (ফারসি মাধ্যমে)–চাকু, তকমা, বাহাদুর, কাঁচি কুলী, উর্দু, কাবু, বিবি, বোচকা, আলখাল্লা ইত্যাদি।

এরই দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা দিল ঊনবিংশ শতক থেকে যখন ইংরেজি শাসনকর্মের ভাষা হিসাবে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। তখন ইংরেজি ভাষা শুধুই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, পশ্চিমের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন চর্চার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য। ফলত ইংরেজি ভাষার আধিপত্য দেখা দিল এবং বাংলাভাষায় এর বহু সংখ্যক শব্দ ক্রমশ এমনভাবে প্রবেশ করল যে বর্তমানে সেগুলি, সমার্থক তৎসম বা তদ্ভব শব্দের থেকে অনেক বহু সংখ্যক শব্দ ক্রমশ এমনভাবে প্রবেশ করল যে বর্তমানে সেগুলি, সমার্থক তৎসম বা তদ্ভব শব্দের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ও জোরালো। লক্ষ করে দেখবেন, এই শব্দগুলি অধিকাংশেরই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই (যেমন–টিকিট, সাইকেল, ইঞ্জিন, টেবিল, গ্লাস, ট্রাম, বাস, ইঞ্জেকশন, বাল্ব ইত্যাদি)। অর্থাৎ এরকম ইংরেজি শব্দগুলি আমাদের কাছে অপরিহার্যরূপে বিবেচিত। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত কথা বলি, তার সিংহভাগই জুড়ে আছে ইংরেজি শব্দ–আপিস (Office), লণ্ঠন (Lantern), বাকস (Box), হাসপাতাল (Hospital), ডাক্তার (Doctor), স্কুল (School), পুলিশ (Police), চেয়ার (Chair), টেবিল (Table), ক্লাস, জাঁদরে (General), স্যার (Sir) ইত্যাদি।

সংখ্যাগত দিক থেকে এরপরই আসে পর্তুগিজ ভাষা থেকে আগত শব্দাবলির প্রসঙ্গ। প্রশাসনিক দিক থেকে নয়, বরং অন্য এক বিচিত্র সম্পর্কে বাংলাভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগসূত্র রচিত হয়েছে। এদেশের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে অনেক নতুন বস্তু ও নবসংস্কৃতির পরিচয় পর্তুগিজ শব্দের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। যেমন–অঙ্গতা, আনারস, আলপিন, আলমারি, কেরানি, চাবি, কপি, আলকাতরা, তোয়ালে, জানালা, বোতল, বালতি, কামরা, বেহালা, পেঁপে, মিস্ত্রি, সাবান, গামলা, পেরেক, সাগু, তামাক ইত্যাদি।

ফরাসিরাও পর্তুগিজ ও ইংরেজদের মতো এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করায় কিছু ফরাসি শব্দও বাংলাভাষায় এসে গেছে। যেমন–কার্তুজ, কুপন, কাফে, রেস্তোরাঁ, রেনেশাঁস, বুর্জোয়া, আঁতাত, ম্যাটিনি, বিস্কুট, মেনু, ওমলেট ইত্যাদি।

সংখ্যালঘু ওলন্দাজ শব্দাবলি বাংলাভাষার ক্ষেত্রে একমাত্র তাসখেলার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে। যেমন–হরতন, রুইতন, ইস্কাপন, তুরুপ। এগুলি ছাড়াও আরও কিছু বিদেশিভাষার শব্দ প্রধানত ইংরেজির মাধ্যমে বাংলা ভাষায় এসেছে। যেমন–

রুশ ভাষা থেকে	–	সোভিয়েত, বলশেভিক, স্পুটনিক
ইতালীর ভাষা থেকে	–	কোম্পানি, গেজেট, ম্যাজেন্টা, ফ্যাসিস্ট।
জার্মান ভাষা থেকে	–	নাৎসী।
স্পেনীয় ভাষা থেকে	–	কমরেড।
চীনা-ভাষা থেকে	–	চা, চিনি।
জাপানি ভাষা থেকে	–	রিকসা, জুজুৎসু।
মালয়ী-ভাষা থেকে	–	গুদাম
বর্মী ভাষা থেকে	–	ঘুগনি, লুঙ্গি।

শব্দ সম্পদ হিসেবে বিদেশি এতগুলি ভাষার কাছে বাংলাভাষা ঋণী। কিন্তু শুধু এখানেই বিদেশি ভাষাগুলির ঋণদান থেমে থাকেনি। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন যে যুগোপযোগী এবং ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে যুতসই নতুন শব্দ গড়ে নিতেও বাংলাভাষা কতবার কতরকমভাবে হাত বাড়িয়েছে বিদেশি ভাষার ভাণ্ডারে। আসুন, আমরা এবার বিচিত্র পথে আসা বিদেশি শব্দের প্রভাবটিকে দেখি– বাংলা শব্দগঠনের ক্ষেত্রে।

(ক) লিঙ্গান্তর সাধনে–ফারসি ভাষার প্রভাবে পাওয়া মদ্দা-কুকুর, মাদী-কুকুর।

(খ) প্রত্যয় হিসাবে–ফারসি 'আনা', 'গিরি', 'দার', 'বাজ', 'সই' প্রভৃতি যোগ করে তৈরি হয়েছে বিবিআনা, বাবুগিরি, কেরানিগিরি, বাজনদার, চালবাজ, ধড়িবাজ, মাপসই, টেঁকসই ইত্যাদি শব্দাবলি।

(গ) উপসর্গ হিসাবে–ফরাসি থেকে আগত উপসর্গ 'ফি', 'বে', 'গর' ইত্যাদি যোগে ফিসন, ফিহপ্তা, বেমানান, বেহাত, গররাজি, গরহাজির–এই জাতীয় শব্দগুলি উৎপত্তি। আবার ইংরেজি কিছু শব্দও এইভাবে উপসর্গের ভূমিকা পালন করে। যেমন–'হাফ্' (হাফ-হাতা, হাফ্-আখড়াই), 'ফুল' (ফুল-হাতা, ফুল-মোজা) বা 'হেড' (হেড-পণ্ডিত, হেড মিস্ত্রি)।

(ঘ) সমাসবদ্ধ পদগঠনে–ফারসি এবং ইংরেজি উভয় ভাষার কাছেই বাংলার ঋণ এ ব্যাপারে প্রায় সমান। আমাদের কথ্য বাংলাভাষায় প্রতিনিয়ত কত যে এই গোত্রীয় শব্দ আমরা ব্যবহার করে চলেছি, তা খুঁজে পেতে দেখলে চমকে যেতে হয়।

ফারসি প্রভাবজাত এরকম শব্দ– রাজা-উজির, হাট-বাজার, শাকসব্জী, ধন-দৌলত, কাগজপত্র, আইন-আদালত ইত্যাদি। ইংরেজি প্রভাবজাত এই পর্যায়ের শব্দ হিসাবে দেখতে পাবেন–মাস্টারমশাই, ডাক্তারবাবু, উকিল-ব্যারিস্টার, ডাক্তার-বদ্যি ইত্যাদি শব্দগুলিকে।

(ঙ) ব্যাক্যাংশের আদি বর্ণ সমবায়ে 'শীর্ষক শব্দ' গটনে –এ বিষয়ে ইংরেজির প্রভাব একচ্ছত্র বলা যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে এ জাতীয় শব্দের বহুল প্রচলন লক্ষ্য করতে পারবেন। যেমন–বি.এ, এম.এ, গ.সা.গু., ল.সা.গু। এখনকার এম.এল.এ বা এম.পি.-রাও এই একই ধারায় জাত।

শব্দভাণ্ডারের আসল সম্পদ হিসাবে আমরা এই আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলিকে অভিহিত করতে পারি। কারণ এতক্ষণের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় নিশ্চয় আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ভাষার সজীবতা নিহিত রয়েছে ক্রমবর্ধমান শব্দভাণ্ডারের মধ্যে, আর শব্দভাণ্ডারের কলেবর বৃদ্ধিতে অন্যতম সহায়ক এই কৃতঋণ শব্দগুলি। মানুষের কৌতূহল, জিজ্ঞাসা, ঔৎসুগক্য যত বেশি তাকে নিজের গণ্ডির বাইরে টেনে আনে, তত বেশি সে দেশ-দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়। সেই নবলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে অভ্যস্ত শব্দে কাজ না হলেই, অন্যভাষার থেকে লাগসই শব্দ সে খুঁজে নেয়, নিজের মতো করে তাকে গড়ে নিয়ে, উদ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশক রূপে সাজিয়ে স্থায়ী আসন দান করে নিজের ভাষার ক্ষেত্রে।

১৯.৫.১ সারসংক্ষেপ:

আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দগুলি তিনটি ধারা থেকে আগত– (১) প্রাচীন অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটবর্মী ভাষাজাত, (২) ভারতীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষাজাত এবং (৩) বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষাজাত যেগুলির

মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে ফারসি এবং ইংরেজি।

তবে এই তিনটি ক্ষেত্রেই লক্ষ করুন--আমরা এই সবগুলি শব্দকেই প্রায় আমাদের নিজস্ব উচ্চারণপ্রবণতার ছাঁচে ঢেলে এমনভাবে নবরূপ দিয়েছি যাতে সেগুলিকে আর বহিরাগত বলে চেনাই যায় না। যেমন–

তুর্কি 'কোয়ামচি' > বাংলা 'কঞ্চি'

আরবি 'জালা-ওয়াতন' > বাংলা 'জ্বালাতন'

ফারসি 'খুল' + আরবি 'মাল' > বাংলা 'গোলমাল'

ফারসি 'আহিস্তা' > বাংলা 'আস্তে'

পর্তুগিজ 'আনান্' > হাংসা 'আনারস'

ইংরেজি 'লর্ড', 'ল্যাম্প', 'সেন্ট্রি' > বাংলা 'লাট', 'লম্ফ', 'সান্ত্রী'।

এমনভাবে চেহারা পাল্টে পেলায় বিদেশি শব্দগুলিও আজ আর মূলভাষার কথা মনে পড়ায় না। উচ্চারণগত স্বাভাবিকতা এই শব্দগুলির সঙ্গে এমনভাবে খাপ খেয়ে গেছে যে এগুলি বর্তমানে বাংলাভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেইকারণে বাংলার নিজস্ব প্রত্যয়-বিভক্তিও এগুলিতে যোগ করা হচ্ছে, যেমন–মাস্টারি, জজিয়তী, ডেপুটিপনা ইত্যাদি।

১৯.৬ নবগঠিত শব্দ:

সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই নবচেতনার প্রকাশোপযোগী শব্দেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। পূর্বলব্ধ ভাষাজ্ঞানের থেকে তখন নতুন শব্দ তৈরি করে নেবার প্রবণতা দেখা দেওয়া অবশ্যম্ভাবী। যেমন ইতিপূর্বে দেখেছেন 'প্রোতিত' শব্দটির উৎপতিত। 'নিরঞ্জন' শব্দটির উৎসও অনেকটা তেমনি–নীরমঞ্জন (সং) > নীরঞ্জণ (প্রা) > রিঞ্জন। বাংলাভাষায় এইরকম আরও বেশ কিছু শব্দের দৃষ্টান্ত দেখতে পাবেন–'বিধবা' শব্দের সাদৃশ্যে 'সধবা' ('ধব' অর্থ স্বামী ধরে নিয়ে), 'অতিরেক' ('অতিরিক্ত' অর্থে), 'কহতব্য', 'মোক্ষম', 'অতিষ্ঠ', 'আবাহন' ইত্যাদি।

অনেক সময় আবার ভিন্ন ভিন্ন ভাষার শব্দ বা শব্দাংশ একত্র জুড়ে বাংলায় নবগঠিত শব্দাবলির সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। এগুলিকে আমরা মিশ্র শব্দ বা সংকর শব্দ (Hybrid Word) বলতে পারি। যেমন–

হেড (ইংবরেজি) + পণ্ডিত (বাংলা) = হেডপণ্ডিত

ফি (ফার্সি) + বছর (বাংলা) = ফি-বছর

দাদা (বাংলা) + গিরি (ফার্সি) = দাদাগিরি

বাবু (বাংলা) + আনা /আনী (ফার্সি) = বাবুয়ানা / বাবুয়ানী

জমি (বাংলা) + দার (ফার্সী) = জমিদার

নবগঠিত শব্দাবলির তৃতীয় ধারাটি মূলত অনুবাদ-প্রক্রিয়াজাত। বেশ কিছু ইংরেজি শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজি প্রভাবিত নবসৃষ্ট এই শব্দগুলিকে বলা চলে অনুদিত ঋণ। এই

শব্দগুলি শুনতে অনেকটা তৎসম শব্দের মতো হলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ বা অভিধানে এগুলিই ঠাঁই নেই। কারণ এগুলি একান্তভাবে আধুনিক যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্ট। যেমন ধরুন– বিশ্ববিদ্যালয়, সিংহভাগ (Lion's Share), সুবর্ণ সুযোগ (Golden Opportunity), পাদপ্রদীপ (Foot light), শীর্ষ সম্মেলন (Summit Conference)। কাঁদানে গ্যাস (Tear Gass), বাতিঘর (Light house), হাতঘড়ি (Wrist-watch) ইত্যাদি শব্দগুলিও এই একইরকমভাবে আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত, তবে এগুলির আকৃতি তদ্ভব শব্দের মতো।

১৯.৭ সারাংশ:

এইবাবে আসুন, সমগ্র এককটিতে আলোচিত বিষয়কে আর একবার আমরা ফিরে দেখি। দেশজ ও বৈদেশিক অবদানে বাংলাভাষার যে বৃহৎ শব্দভাণ্ডার গড়ে উঠেছে, তার একটি সারণি আমরা এইভাবে তৈরি করতে পারি–

বাংলা শব্দভাণ্ডার

- মৌলিক বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শব্দাবলি
  - তৎসম শব্দ
    - সিদ্ধি
    - অসিদ্ধি
  - অর্থতৎসম
  - তদ্ভব শব্দ
    - নিজস্ব
    - কৃতঋণ বা বিদেশি তদ্ভব (দ্রাবিড়, অস্ট্রিক) ইত্যাদি
- আগন্তুক বা কৃতঋণ শব্দাবলি
  - দেশিশব্দ (দ্বাবিড়, অষ্টিক ভোটবর্মী)
  - প্রাদেশিক শব্দ (হিন্দু, মারাঠী গুজরাটী, পঞ্জাবী)
  - বিদেশি শব্দ (ফারসি, ইংরেজি পর্তুগিজ, ফরাসি, রুশ, জার্মান, স্পেনীয়, চীনা, জাপানি ইত্যাদি
- নবগঠিত শব্দাবলি
  - ভুয়া শব্দ
  - মিশ্র বা সংকর শব্দ
  - অনূদিত বিদেশি শব্দ

মনে রাখবেন, শব্দ ভাণ্ডারের এই গড়ে ওঠা এক অনন্ত প্রক্রিয়া। ব্যাকরণের নিয়মবদ্ধতা এখানে সবসময় খাটে না। দৈনন্দিন প্রয়োজনই এখানে শেষকথা। তাই সংবাদপত্রের সূত্রে, দেশি-বিদেশি সাহিত্যের সূত্রে, অধুনা দূরদর্শনের প্রভাবেও অহরহ নতুন শব্দ চলে আসছে আমাদের ভাষায়। এইভাবে বহু নদীধারাপুষ্ট সমুদ্রের মতোই বাংলা শব্দভাণ্ডারও দিনে দিনে স্ফীট ও সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে।

১৯.৮ অনুশীলনী:

১। অতি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচয় দিন:

(ক) সংকর বা মিশ্র শব্দ।
(খ) অর্থ-তৎসম বা ভগ্ন-তৎসম শব্দ
(গ) অনূদিত কৃতঋণ শব্দ।
(ঘ) ভুয়া শব্দ।

২। নিম্নোক্ত শব্দগুলির উৎস নির্ণয় করুন।

মানানসই, বেআক্কেলে, দাদাগিরি, হাসপাতাল, লেডিকেনি, লামা, বাগান, গেরাহ্যি, সেমাথ, সোয়ামি, খড়্গহস্ত, ঢেউ, ডাহা, ওজা, ইঁদারা।

৩। পার্থক্য নির্ণয় করুন।

(ক) কৃতঋণ তদ্ভব শব্দ এবং কৃতঋণ / আগন্তুক শব্দ।
(খ) অসিদ্ধ তৎসম শব্দ এবং তৎসমকল্প 'ভুয়া' শব্দ।

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে বাংলা শব্দের দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করুন।

(ক) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নিজস্ব শব্দ সম্পদ।
(খ) বিদেশি ভাষা থেকে আগত শব্দাবলি।
(গ) নবগঠিত শব্দাবলি।

১৯.৯ উত্তর সংকেত :

১. (ক) ১৯.৬ (খ) ১৯.৪.১ (গ) ১৯.৫

১৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি:

১. ড. সুকুমার সেন–ভাষার ইতিবৃত্ত।
২. ড. রামেশ্বর শ–সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা।
৩. ড. জীবেন্দু রায়–বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।
৪. পরেশচন্দ্র মজুমদার–বাংলা ভাষা পরিক্রমা।